এমনকি ন্যূনতমটুকুও না!

সুস্মিতা এস পৃথা

পাঁচ বছর পর সম্প্রতি গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে, যা শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের দাবি করা ১৬০০০ টাকার অর্ধেক। গত ২৯ সেপ্টেম্বর স্টার উইকএন্ডে সুস্মিতা এস পৃথা 'Not even the bare minimum' শিরোনামে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ও যুক্তি পর্যালোচনা করেছেন। *সর্বজনকথা*র পাঠকদের জন্য এই লেখা অনুবাদ করেছেন ***সৈকত মল্লিক***।

রেনু বেগম যখন গার্মেন্টে কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর! শৈশবের স্মৃতি খুব কমই তিনি মনে করতে পারেন। দরিদ্র জেলে বাবার মেয়ের আর কী-ই বা স্মৃতি থাকে মনে রাখার মত, বলার মত! নদী-খাল-বিলের পানিও দিন দিন শুকায়, জেলে পরিবারের ভাতের হাঁড়িও পালা দিয়ে খালি হতে থাকে। উপায়ান্তর মেলে না তাঁদের। অগত্যা রেনুদের পুরো পরিবারই কাজের অভাবে গ্রাম ছেড়ে নব্বইয়ের শুরুর দিকে ঢাকায় পাড়ি জমায় নতুন কাজের আশায়। কিন্তু রাজধানী ঢাকা তো রেনুর জেলে বাবার মত অদক্ষ, চালচুলাহীন মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ রাখেনি।

'আমার বাবা যে টাকা কামাই করত তা দিয়ে ঘরভাড়াও হত না। এভাবেই কোনমতে চলত, খেয়ে না খেয়ে! একদিন আমাদের এক প্রতিবেশী খবর দিল, পাশের একটা গার্মেন্ট কারখানায় কম বয়সী মেয়েদের হেলপার হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। তার পরামর্শে ঢুকে গেলাম কাজে। সেই থেকে আমার শ্রমিকজীবনের শুরু, আজও চলছে।' কথাগুলো বলতে বলতে রেনুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। লুকিয়ে আঁচল দিয়ে চোখটা চট করে মুছে নেন।

হেলপার হিসেবে তখন রেনুর বেতন ছিল ৩০০ টাকা। তখন থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি গার্মেন্ট কারখানায় বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। কোথাও কয়েক বছর, কোথাও বা কয়েক মাস। এখন মিরপুরের একটা ফ্যাক্টরিতে 'ফোল্ডিং ম্যান' হিসেবে কাজ করছেন। ১২ বছরের শিশু রেনু ৩০০ টাকা বেতনে কাজ শুরু করেছিলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরে তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৭৩০০ টাকা হয়েছে।

ওভারটাইমের কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে রেনু বলছিলেন, 'সেই কবে, ছোটকাল থেকে কাজ করছি তো করছিই, করেই যাচ্ছি, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন নাই, কোন উন্নতি নাই! আমরা আগেও পেটে-ভাতে বাঁচতাম, এখনও ওই একই রকম দিন আনি দিন খাই অবস্থা। ওভারটাইম না করলে পরিবার চালানোর অন্য কোন উপায় তো আমার নাই।'

ছোট মেয়ে মীম আর ভাগ্নি সাদিয়াকে নিয়ে ছোট্ট একটা রুমে থাকেন রেনু। তাঁদের মত আরও ছয়টা পরিবার মিলে একটা টিনের চালার বাড়ি ভাড়া করেছেন। ওই ছোট ঘরের ভাড়াই ৩০০০ টাকা, যেটা রেনুর বেতনের প্রায় অর্ধেক। প্রতি মাসে বেতন পাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ২০০০ টাকা পাঠান। বাচ্চার স্কুলের ফি ৮০০ টাকা, সাথে বই-খাতা-কলমের খরচ আছে। তা ছাড়া প্রতি মাসে টুকটাক হাত-খরচ, তেল-সাবান-জামা-স্যান্ডেলসহ অন্যান্য সাংসারিক খরচ আছে কমবেশি ১৫০০ টাকা। বাকি ২-৩ হাজার টাকা খাবারের পেছনে ব্যয় হয় রেনুর। খাবার বলতে মূলত ভাত, আলুভর্তা, সবজি, ডিম বা ডাল। এগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়া হয় তাঁদের। মাছ বলতে তেলাপিয়া কিংবা পাঙ্গাশ, আর মাংস বলতে ব্রয়লার মুরগি। ওই মাছ-মাংসও কোন সপ্তাহে হয়, আবার হয়ও না। পাই পাই হিসাব করে চলার চেষ্টা করেন রেনু।

ক্ষোভ নিয়ে রেনু বলতে থাকেন, 'কষ্ট কি আর সাধে করি! মাস শেষে ঠেকে পড়লে কোথায় যাব বলেন! কোন মাসে যদি মীম অসুস্থ হয় বা আমার মা-বাবার যদি বেশি টাকার প্রয়োজন হয়, কিংবা ধরেন হঠাৎ কোন জরুরি দরকার লাগে, তখন আমার বোন বা কোন প্রতিবেশীর কাছে ধার করতে হয়। পেটে-ভাতে চলে তো আর টাকা জমানো যায় না! এ কারণেই আমি যতটুক পারি ওভারটাইম করি। দিনে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা এবং মাঝে মাঝে ছুটির দিনও ওভারটাইম করা ছাড়া মাসের খরচ চালানোর অন্য কোন উপায় নাই আমার।'

লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির বাজারের সাথে তাল মেলানোর জন্যই রেনু যত ঘণ্টা পারেন ওভারটাইম করে অতিরিক্ত আড়াই-তিন হাজার টাকা আয় করার চেষ্টা করেন। বেশির ভাগ দিনই ১২ ঘণ্টা কাজ করেন, আর কারখানায় যেতে-আসতে আরও এক ঘণ্টা হাঁটতে হয়। রিকশায় ওঠার ক্ষমতা নেই তাঁর! তা ছাড়া রিকশা তো তাঁর জন্য এক বিশাল বিলাসিতা!

পাঁচ বছর পর ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে ৫৩০০ টাকা থেকে ৮০০০ টাকা, যেটা শ্রমিকরা ও তাদের প্রতিনিধিদের ১৬০০০ টাকা দাবির অর্ধেক। কোথায় বাড়ল ন্যূনতম মজুরি? ২৫ বছর ধরে গার্মেন্ট সেক্টরে কাজ করতে করতে বর্তমানে 'ফোল্ডিং ম্যান' রেনুর মজুরি কত বাড়ল? সেই হিসাবটা কোথায়? রেনুর মত শ্রমিকরা এখনও জানে না, তাদের বেতন আসলেই বাড়বে কি না বা বাড়লেও কত বাড়বে। এ বিষয়ে জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম আমিন বলেন, 'মজুরি বোর্ড শুধু সপ্তম গ্রেডের অদক্ষ নতুন শ্রমিকরা, যারা পুরো শ্রমশক্তির মাত্র ৫ শতাংশ এবং মূলত হেলপার হিসেবে কাজ করে, তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। এটা জরুরি বিবেচনার ব্যাপার যে হেলপারের ওপরের পদে কাজ করা অন্যান্য গ্রেডের দক্ষ ও সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শ্রমিকের বেতন কত হবে?' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'এটা খুবই সম্ভব যে তারা ওপরের গ্রেডের শ্রমিকদের মজুরি খুব কম হারেই পরিবর্তন করবে। যদি তা-ই করে তাহলে এই ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি আসলে শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া কিছু না।'

আরও একটা বড় ফাঁক আছে এখানে, সেটা হল মজুরি বোর্ড বলছে, ২০১৩ সালে শেষবারের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির সাপেক্ষে এবার ৫১% বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র হল, ৫৩০০ টাকা ধরেই সপ্তম গ্রেডের একজন শ্রমিকের বেতন ২০১৮ সালের শেষে, আইন অনুযায়ী প্রতিবছর ৫% হারে ইনক্রিমেন্টসহ দাঁড়াবে ৬৭৬৪ টাকা। ফলে সেই হিসাবে আসলে মজুরি মাত্র ১৮% বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) তাদের একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখানো হয়েছে, গত পাঁচ বছরে

একজন শ্রমিকের গড় মাসিক খরচ ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বাস্তবতা অনুযায়ী শ্রমিকের জন্য কী বাড়ল, কতখানি বাড়ল? কী উন্নয়ন হল শ্রমিকের?

শ্রমিকদের দুর্দশার এখানেই শেষ নয়। ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী শ্রমিকদের মূল বেতন ৩৭০০ টাকা (বার্ষিক ৫% হারে ইনক্রিমেন্ট) থেকে বেড়ে ৪১০০ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৩ সালের ঘোষণা অনুযায়ী, ৫৩০০ টাকা মোট মজুরির মধ্যে মূল মজুরি ছিল ৩৭০০ টাকা আর এবার ৮০০০ টাকার মধ্যে মূল মজুরি ৪১০০ টাকা। তার মানে হল, মোট মজুরির তুলনায় শ্রমিকদের মূল বেতন কমানো হয়েছে। অথচ এই মূল বেতনের ওপর ভিত্তি করেই শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের বোনাস, ভাতা, ওভারটাইমের টাকার হিসাব করা হয়।

এ বিষয়ে আলাপকালে শ্রমিক অধিকার সংগঠক কল্পনা আক্তার বলেন, 'একজন শ্রমিকের মজুরি ঘণ্টাপ্রতি যত টাকা হয়, ওভারটাইম করলে সেই পরিমাণ ঘণ্টাপ্রতি দ্বিগুণ হয়। এই হিসাবটা করা হয় তার মূল বেতন অনুযায়ী। একজন শ্রমিক ৩৭০০ টাকা বেসিক বেতন হিসাবে প্রতি ঘণ্টা ওভারটাইমের জন্য ৩৫ টাকা পায়, আর এবারের নতুন ঘোষিত মূল বেতন ৪১০০ টাকা অনুযায়ী সেটা হয় ৩৯ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছর পর মাত্র ৪ টাকা ওভারটাইম/ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে, যেটা বছরে ১ টাকাও না। যেখানে বেশির ভাগ শ্রমিকই জীবনযাপনের ব্যয় সামাল দিতে ওভারটাইম করতে বাধ্য হয়, সেখানে এ ধরনের তামাশার মজুরি বৃদ্ধি খুবই ভয়ংকর ব্যাপার।' আর এটা শুধু ওভারটাইমের জন্যই নয়, সব ধরনের কর্ম ভাতা, উৎসব ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড–প্রায় সব ধরনের ভাতাই আসলে এই মূল বেতনের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়। ফলে মূল বেতনের অনুপাত কমিয়ে দেয়ার ফলে আসলে ওই সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রেনু যেমন তাঁর মাসিক খরচ চালানোর জন্য ওভারটাইম করে পোষানোর চেষ্টা করেন, নতুন ঘোষিত মূল বেতন অনুযায়ী ওভারটাইম করে খুব বেশি টাকা তাঁর আর উপার্জন হবে না। যদিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘরভাড়া বৃদ্ধি কিছুই থেমে থাকবে না। এভাবেই মূল বেতন বৃদ্ধির হার কমিয়ে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে শ্রমিকদের।

এই হিসাব-নিকাশ শুনে রেনু উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'আমি আমার সামান্য বেতনে বড় মেয়েটার পড়াশোনা চালাতে না পেরে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ওকে বিয়ে দিতে বাধ্য হইছিলাম। এবারও যে হিসাব দেখছি, তাতে সংসার চালাতে হয় আমার ছোট মেয়ে মীমকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে, না হয় ওকেও গার্মেন্টে কাজে ঢুকে যেতে হবে, যাতে দুইজনের বেতনে বেঁচে থাকা যায়।'

তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে মীম পড়াশোনায় খুব ভাল। ওকে নিয়ে রেনু অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন। 'আমাদের অফিসে একজন ডাক্তার আপা আছে। আমার মীমও যদি ডাক্তার হতে পারত! কিংবা একজন শিক্ষক! তাহলে কতই না ভাল হত–মীম আমার দেখভাল করতে পারত, তাই না?' স্বপ্নাতুর চোখ নিয়ে রেনু প্রশ্ন করেন।

পরক্ষণেই রেনুর হাসিমুখ হতাশায় ভরে ওঠে। মীমকে একটা ভাল স্কুলে পড়ানোর সামর্থ্যই তো তাঁর নেই, সে জন্যই তো ওকে মাদরাসায় ভর্তি করাতে হয়েছে। রেনু আক্ষেপের সুরে বলতে থাকেন, 'আমার মেয়ে আমাকে বলে একটা বাংলা স্কুলে ভর্তি করাতে, যেখানে শুধু আরবি পড়ানো হয় না, অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হয়। কিন্তু আমি কিভাবে ওকে ওই স্কুলে দেব বলেন? ওখানে তো খরচ আরও বেশি। মাদরাসায় সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মীম থাকে, তাতেই মাসে আমার ৮০০ টাকা করে দিতে হয়। আমি যদি ওকে ভাল স্কুলে দিতে চাই তাহলে ওর জন্য আরও বেশি টাকা লাগবে, শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ানো লাগবে, কোচিং লাগবে। এত খরচ আমি কিভাবে দেব বলেন?'

তা ছাড়া সকাল থেকে রেনুর কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত মীম মাদরাসায়ই থাকে, এটা তো ওর জন্য একটা নিরাপত্তাও বটে। আর মেয়ের সাথে কাটানোর জন্য রেনু খুব কম সময়ই পান, সে জন্য ওর দেখাশোনার জন্য বাধ্য হয়ে মাদরাসার ওপরই নির্ভর করতে হয় রেনুকে।

একের পর এক ঋণ, মা-বাবার স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা ইত্যাদি তাঁদের আর্থিক চাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে। এটাও সময়ের ব্যাপার মাত্র যে মীমকেও ওর মা আর বড় বোনের পথই ধরতে হবে! দারিদ্র্যের চক্রে জন্ম নেয়া মীমেরও এখান থেকে বের হওয়ার অন্য কোন রাস্তা নেই, অন্য কোন সুযোগ নেই। এটাই হয়ত নিয়তি!

এই যখন রেনুদের অবস্থা, তখন উল্টো চিত্র হল– গার্মেন্ট কারখানা বেড়েই চলছে, বেড়েই চলছে। দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত হল এই তৈরি পোশাক শিল্প। ২০১৮ সালে এই খাত থেকে আয় হয়েছে ৩০.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, রফতানি প্রবৃদ্ধির হার হিসাবে সেটা ৮.৭৬ শতাংশ।

আসলে কে আছে ঝুঁকিতে? আর কার ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক অধিকারের কর্মীরা মনে করছেন, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির এই হার শুধু গার্মেন্ট শিল্পের মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি, তাদের চাহিদা ও বেঁচে থাকার বাস্তব পরিস্থিতিও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যদিও বিজিএমইএর সভাপতি ও মজুরি বোর্ডের মালিক প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান শ্রমিক স্বার্থ অগ্রাহ্যের বিষয়টি মানতে রাজি নন। তিনি বরং গার্মেন্ট খাত কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে আছে সেগুলো নিয়ে বেশি চিন্তিত। এ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা হল, 'প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব, নতুন ডিজাইন ও নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি এই ইন্ডাস্ট্রিকে পেছন থেকে টেনে ধরেছে, এগোতে দিচ্ছে না। গত পাঁচ বছর আমাদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিতে অনেক বেশি নজর দিতে হয়েছে, যা অন্যান্য উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।'

ইন্ডাস্ট্রির দুর্বলতার জন্য শ্রমিকদের খেসারত দেয়া উচিত কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'দেশে কতগুলো কারখানা আছে, যারা অদক্ষ শ্রমিকদের ১০০ ডলারের সমান বেতন দেয়? ওই শ্রমিকরা তো কারখানার কলকব্জা ভেঙে কাজ শেখে আর কারখানা তাদের বেতন দেয়।'

সিদ্দিকুর রহমান আরও বলেন, 'আমাদের শ্রমিকদের অদক্ষতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে ওদের জন্য যে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে সেটাই অনেক বেশি।' যখন প্রশ্ন করা হল, আমাদের শ্রমিকরা জন্মগতভাবেই অন্য দেশের শ্রমিকদের চেয়ে কম উৎপাদনশীল কি না! এর জবাবে সিদ্দিকুর 'শ্রমিকদের কোন সমস্যা না' বলে স্বীকার করে বলেন, 'সমস্যাটা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়াটা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তা বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচুর সুপারভাইজার ও মিড-লেভেল ব্যবস্থাপক দরকার, যাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, ধরে রাখা যায়। এমনকি আমাদের দেশে মেশিনের চেয়ে শ্রমিকের অনুপাত অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।' কিন্তু গার্মেন্ট খাতের অব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনাহীনতার দায় শ্রমিকদের ওপর বর্তায় কি না, সেই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তবু পাওয়া

গেল না মালিকপক্ষের প্রতিনিধির কাছ থেকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ মনে করেন, গার্মেন্ট মালিকদের এমন দাবি প্রকৃত পরিস্থিতির সাথে মেলে না। তিনি বলেন, 'ইন্ডাস্ট্রির ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও রফতানি আয় বৃদ্ধিই প্রমাণ করে শিল্পের সক্ষমতা ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা দুটোই বেড়েছে। প্রতিবারই যখন মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টা সামনে আসে তখনই মালিকরা বলতে থাকেন, মজুরি বাড়লে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে ইত্যাদি। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরি টাকার হিসাবে ৬ গুণ বেড়েছে আর গার্মেন্ট খাত থেকে রফতানি আয় ডলারের হিসাবে বেড়েছে ১৪ গুণ। কাজের অর্ডার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মালিকদের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার কারণে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমছে। এ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ প্রতিটা পণ্যের জন্য ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।'

এ ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদের যুক্তিও জোরালো। তাঁদের মতে, 'মজুরি বৃদ্ধি যদি একটা শিল্পকে প্রতিযোগিতাহীন, ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে অন্যান্য বড় রফতানিকারক দেশ, যেমন–চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন কিভাবে এত উন্নতি করতে পারল? সেসব দেশে তো ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাবিত ১০০ ডলারের চেয়ে বেশি। তাহলে তারা কিভাবে পারছে?'

আর আমরা যখন দেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলোতে গার্মেন্ট শিল্পের ঝুঁকির খবর গুরুত্বসহকারে প্রচার হতে দেখি, তখন শ্রমিকদের দুর্দশার খবর কোথায় থাকে? পারিবারিক/গৃহস্থালির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সরকারি জরিপ-২০১৬ অনুযায়ী, গৃহস্থালির গড় ব্যয় ১৫৭১৫ টাকা। কিন্তু গার্মেন্ট শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ মিলিয়েও ওই টাকার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি বিষয়ে আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, 'বাংলাদেশের মজুরি অস্বাভাবিক রকম কম ও অযৌক্তিক। সিপিডির গবেষণায় বলা হচ্ছে, একটা শ্রমিক পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য কমপক্ষে ২২০০০ টাকা প্রয়োজন। সেখানে শ্রমিকরা দাবি করেছে ১৬০০০ থেকে ১৮০০০ টাকা। এটা তো মজুরি বৃদ্ধির দাবি নয়, এটা শুধু মজুরি যৌক্তিকীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপের দাবি মাত্র।'

কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখা

একজন শ্রমিকের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন তার সাথে ন্যূনতম মজুরি কোনভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়। জাতিসংঘ গৃহীত মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণার আর্টিকল ২৩-এ উলেখ আছে, 'যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকেরই ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার আছে, যা তার এবং তার পরিবারের মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য সামাজিক সুরক্ষাগুলোও নিশ্চিত করবে (টঘউঐজ ১৯৪৮)।' বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বাঁচার মত মজুরি বলতে সেই পরিমাণ মজুরিকে বোঝায়, যা দিয়ে একজন মানুষ তার মৌলিক অধিকার, যেমন– পুষ্টিকর খাবার, পরিষ্কার ও নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, বস্ত্র, বিনোদন ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা মেটাতে পারবে, এবং সেই মজুরির মধ্যে ওভারটাইম অন্তর্ভুক্ত হবে না, তার নিয়মিত কর্মঘণ্টার মাধ্যমেই তা পাবে, এবং সেই মজুরি যেন একজন শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের লালন-পালন করার জন্যও পর্যাপ্ত হয়। বাঁচার মত মজুরির এই সংজ্ঞা এবং Purchasing Power Parity (PPP)-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি ২০১৭ সালের মানে হবার কথা ৩৭৬৬১ টাকা।

এমনকি উদারভাবে করা হিসাব মতেও বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রমিক পরিবারগুলো যেভাবে বেঁচে থাকে সেটাকেই মানদণ্ড ধরা হয়েছে, তাদের কিভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া উচিত সেই মানদণ্ড নয়! সেই মানদণ্ড এমন, যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণে কাউকে ঋণগ্রস্ত হতে না হয়, তাদের আয় এমন হবে, যাতে তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্য সদস্যদের যেন খরচ সামাল দিতে বাড়তি টাকার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ করতে না হয়। 'ন্যূনতম মজুরি' যেখানে শুধু জীবন টিকিয়ে রাখার বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেয়, সেখানে 'বাঁচার মত মজুরি' অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বাইরেও সম্মানজনক জীবনের কথা বলে। সিপিডির জরিপ দেখাচ্ছে, শ্রমিকদের বিদ্যমান জীবনমান অনুযায়ী অন্তত ১৭% শ্রমিক রাতে বিছানা ছাড়া ঘুমায়, ১৬% শ্রমিকের ঘরে সিলিং ফ্যান ব্যবহার করার অবস্থা নেই, ৮৬% শ্রমিককে অন্যান্য পরিবারের সাথে টয়লেট ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয় এবং ৪৫% শ্রমিক তাদের আয় থেকে কোন সঞ্চয় করতে পারে না। বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি 'কিভাবে বাঁচে শ্রমিক' শিরোনামে ২০০ জন শ্রমিকের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে করা সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছে, ৩৪% শ্রমিক মাসে এক দিনও বড় মাছ খায় না, ১৯% শ্রমিক গরু বা খাসির মাংস খায় না এবং ১৭% মুরগির মাংসও খায় না। গবেষণাপত্রটির মাধ্যমে আরও দেখা গেছে যে গড়ে একজন শ্রমিক খাবারের জন্য মাসে ১১১০ টাকা খরচ করার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের মতে, ৮ ঘণ্টা কাজ করা একজন মানুষের দৈনিক ২৮০০ কিলোক্যালরির প্রয়োজন হয়। গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী ২৮০০ কিলোক্যালরি গ্রহণের জন্য ৩২৭০ টাকার খাবার প্রয়োজন। তার মানে বর্তমানে একজন শ্রমিকের যা সামর্থ্য আছে তা দিয়ে তার প্রয়োজনীয় ক্যালরির তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র পূরণ করতে পারে। তার পরও এই হিসাবে আরও অনেক কিছু বিবেচনায় আনা হয়নি, যেমন– উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন খাবার, যেমন–ফলমূল, মাংস, দুধ– এগুলোর খরচ ধরাই হয়নি।

এই সংখ্যাগুলো আমাদের খুবই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বাঁচার মত বিষয়ে সত্যিকারের যে আলোচনা, আমরা তার ধারেকাছেও নেই। এবং শুধু সরকার ও ফ্যাক্টরি মালিকদের দেখার দৃষ্টি পরিবর্তন করলেই চলবে না, বড় বড় ক্রেতা, যারা বিশ্বব্যাপী সাপাই চেইনে বাঁচার মত মজুরি নিশ্চিত করতে চটকদার ও মহৎ প্রতিশ্রুতি দেয়, তারাও শ্রমিকদের পর্যাপ্ত বেতন ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করতে ঘোষিত অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ব্র্যান্ডগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পারস্পরিক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন দেশের ভবিষ্যৎ ও সেই ভবিষ্যৎ নির্মাণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ভাবি, তখন লক্ষ্যটা ন্যূনতমের চেয়ে আরও উঁচুতে স্থির করার দায় রয়েছে আমাদের।

সুস্মিতা পৃথা: সাংবাদিক, গবেষক।
ইমেইল: sspreetha@gmail.com
সৈকত মল্লিক: গার্মেন্ট সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী।
ইমেইল: saikatmollik403@gmail.com